নির্বাচনটা নীতিভিত্তিক না হলে কু-কথার স্রোত এবং মানি-মাফিয়ার ব্যবহার বাড়বেই

ভারতে নির্বাচনগুলি যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে, নির্বাচনে ভালমন্দ বিচারটাই যেন ক্রমাগত হারিয়ে যচ্ছে। দল বা দলীয় প্রার্থীর নীতি-আদর্শ কী, সে আদর্শ সমাজ বা দেশের অগ্রগতির সহায়ক কি না, দেশের মৌলিক সমস্যা বিশেষভাবে বেকার সমস্যা, শিল্পায়নের সমস্যা, কৃষির সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত কি না ইত্যাদি কোনও বিষয়ই বিচারের মধ্যে মূলত আনা হচ্ছে না। না মিডিয়া প্রচারে, না দলীয় প্রচারে কোথাওই এর লেশমাত্র নেই। নির্বাচন দাঁড়িয়ে গেছে 'কে জিতবে, কে হারবে' এই গণ্ডিতে। জনস্বার্থে কার জেতা উচিত, কার হারা উচিত এবং এই কারণে উচিত ইত্যাদি বিষয় প্রচারে নেই।

প্রার্থীরা একে অপরের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য রাখছে সেখানে বইছে কু-কথার স্রোত। সোস্যাল মিডিয়াতেও ছড়ানো হচ্ছে কুরুচিকর, অশালীন বক্তব্যের বিষ। তাতে রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। রাজনৈতিক সহনশীলতার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিদ্বেষ মাথা তুলছে। এই কু-কথার স্রোত এত লাগামছাড়া যে, তা নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন কমিশন বলছে তারা অসহায়। শুধু কি পশ্চিমবঙ্গে? প্রতিটি রাজ্যেই এ জিনিস চলছে এবং সংসদীয় সব রাজনৈতিক দলের তাবড় তাবড় নেতারা পর্যন্ত এর বাইরে নন।

একে অপরের বিরুদ্ধে এরা চিন্তা সমৃদ্ধ রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে পারছেন না কেন? বিচার করলে দেখা যাবে, তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যে শব্দ এবং বাক্যগত পার্থক্য যাই থাকুক, প্রত্যেকের রাজনীতি এক সুরে বাধা। সেটা কী? সেটা হচ্ছে যেভাবেই হোক ভোটে জেতা এবং সরকার গঠন করে ভারতের শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কাজ করা, পার্লামেন্টে বা বিধানসভায় তাদেরই স্বার্থে নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া। এদের বিগত বছরগুলির ইতিহাস বা কার্যধারা বিচার করলে এই বক্তব্যের সত্যতা অবশ্যই মিলবে। তা হলে প্রতিটি দলই যদি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়, তা হলে তারা কী করে একে অপরের বিরুদ্ধে নীতিগত এবং পরিশীলিত রাজনৈতিক বক্তব্য রাখবে? কী করেই বা সাধারণ মানুষের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়াবে? এটা সম্ভব নয়। আবার সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বা বিভ্রান্ত করে— পক্ষে আনতে না পারলে ভোটে জেতা মুশকিল। সেই কারণে এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যক্তি আক্রমণ, কুৎসা— এ সবেই মত্ত।

আরেকটা জিনিস প্রবলভাবে চলছে। সেটা হচ্ছে টাকার থলি ও গুন্ডারাজের ব্যবহার। প্রার্থী হতে বাধা দেওয়া, প্রচার করতে বাধা দেওয়া, বুথ দখল করে ছাপ্পা মারা, গণনা কেন্দ্রে পর্যন্ত ছাপ্পা দিয়ে বিরোধী ভোট বাতিল করা সবই এ রাজ্যের মানুষ বিগত নির্বাচনগুলিতে দেখেছে। অন্য রাজ্যেও ঘটছে। বিষয়টা এত ব্যাপক যে, ভারতের ১৬তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলা পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, 'গুন্ডারাজ এবং টাকার থলির অশুভ জোট ভারতের গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে'। (হিন্দুস্থান টাইমস— ২৬.১২.২০১৭)।

নবীন চাওলা সাড়ে পাঁচ বছর ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচন তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়েছে। তাঁর কার্যকালে রাজ্যে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনও। সে সব দেখে তাঁর উপলব্ধি 'মানি পাওয়ার' এবং 'মাসল পাওয়ার' হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্বাচনে জেতার মূল নিয়ামক। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ভারতীয় গণতন্ত্রে গুন্ডারাজের প্রাদুর্ভাব কোনও নতুন বিষয় নয়, '৭০-'৮০-র দশক থেকেই এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা বাড়তে শুরু করেছে।

চাওলা তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, এখন কোটিপতি এবং ক্রিমিনালরাই নির্বাচনে জয়ী হয়। দেখিয়েছেন ১৫তম বা ১৬তম লোকসভায় প্রায় ৩০ শতাংশ সাংসদের বিরুদ্ধেই এক বা একাধিক ক্রিমিনাল কেস বা ফৌজদারি মামলা রয়েছে। খুন, খুনের উদ্দেশে আক্রমণ, তোলাবাজি, ধর্ষণ, অপহরণ, ডাকাতি— এই ধরনের মামলাই তাদের বিরুদ্ধে বেশি। বোঝা যায় জনস্বার্থে আন্দোলন করার জন্য পুলিশ এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেনি, মামলা সত্যিই অপরাধজনিত।

রাজনৈতিক দলগুলি এদের প্রার্থী করে কেন? এদেরই বা কেন সাংসদ হওয়া জরুরি প্রয়োজন? সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি এদের প্রার্থী করে এদের মস্তান বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে সহজে ভোটে জেতার জন্য। '৮০-র দশক পর্যন্ত এই সব মাফিয়ারা বাইরে থেকে রাজনৈতিক দলকে বা তার প্রার্থীকে সাহায্য করত যাতে প্রার্থী বিজয়ী হয়ে ক্রিমিনালদের স্বার্থ রক্ষা করে— পুলিশি গ্রেপ্তার থেকে বাঁচায় বা নিদেন পক্ষে তাদের কাজে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এখন তারা নিজেরাই নির্বাচনে দাঁড়ায়, যাতে বিধায়ক সাংসদ হয়ে নিজেরাই সব কন্ট্রোল করতে পারে।

২০১৪ সালে যে লোকসভা নির্বাচন হল এবং বিজেপি সরকার গঠন করল, সেই লোকসভায় ৫৪৩ জন সাংসদের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ৪৪২ জন। দেশের অতি নগণ্য অংশ কোটিপতি। ৯৫ ভাগ মানুষই তো গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত। সংসদে তাদের প্রতিনিধি কোথায়? বাস্তবে পার্লামেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে ধনীদের প্রতিষ্ঠান। এই কোটিপতি সাংসদরা কী সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করে? তথ্য বলছে, সংসদে যতগুলি জনবিরোধী বিল পাশ হয়েছে তাতে সম্মতি দিয়েছে এই সাংসদরা।

জনসাধারণ কোটিপতি এবং ক্রিমিনাল প্রার্থীদের বারবার ভোট দিচ্ছেন কেন? তাদের হয়ে কাজ করবে এমন প্রার্থীদের কেন তারা ভোট দিচ্ছেন না বা নির্বাচিত করছেন না? এখানেই রয়েছে মিডিয়ার ভূমিকা। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া থেকে প্রিন্ট মিডিয়া এখন পুরোপুরি পুঁজিপতি শ্রেণির কব্জায়। পুঁজিপতি শ্রেণি যে প্রার্থীদের মনে করে তার বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে কাজ করতে পারে, সেই সেই প্রার্থীর বা প্রার্থীর দলের হয়ে এমন জোরালো প্রচার শুরু করে যে, সাধারণ মানুষের চোখ ঝলসে যায়। প্রচারের তোড়ে মানুষ ভাবতে শুরু করে এই প্রার্থীরই জেতার সম্ভাবনা। ফলে তাকেই ভোট দিয়ে দেয়।

এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তাবিদ শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "ইলেকশন হচ্ছে একটা বুর্জোয়া পলিটিক্স। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে, শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম এবং শ্রেণি সংগঠন না থাকলে, গণআন্দোলন না থাকলে, জনগণের সচেতন সংঘশক্তি না থাকলে শিল্পপতিরা, বড় ব্যবসায়ীরা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা বিপুল টাকা ঢেলে এবং সংবামাধ্যমের সাহায্যে যে হাওয়া তোলে, যে হাওয়া তৈরি করে, জনগণ উলুখাগড়ার মতো সেই দিকে ভেসে যায়।"

নির্বাচনে এক একটি কেন্দ্রে যত প্রার্থী থাকে বুর্জোয়া মিডিয়া তার মধ্যে থেকে দু'তিন জন প্রার্থীকে প্রচার দেয়। বাকিদের কথা উল্লেখ করে না বললেই চলে। এটা একটা বুর্জোয়া ষড়যন্ত্র। সাধারণ মানুষ এই ফাঁদে পড়ে বুর্জোয়া প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বুর্জোয়াদের প্রার্থীকে নিজের পছন্দের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করে বসেন। ফলে বুর্জোয়াদের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়ে বুর্জোয়াদের স্বার্থেই কাজ করে। জনগণের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে নানা বিল পাশ করায়। তার বিনিময়ে বুর্জোয়াদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্তিও ঘটে। স্বাধীনতার পর থেকে এই জিনিসই ঘটছে। যা দেখে সাধারণ মানুষ বলেন, 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। এরা যে লঙ্কায় যাওয়ার আগেই রাবণ জনসাধারণ তা ধরতে পারেন না প্রচারের জৌলুসে। যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণ শ্রেণি সচেতন না হচ্ছে, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির সত্যিকারের দল এবং প্রার্থীকে চিনতে না পারছে, তার পক্ষে বলিষ্ঠভাবে না দাঁড়াচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

চিকিৎসাহীন সুপার স্পেশালিটি!

ভোটের প্রচারে তৃণমূল সরকার বলছে, রাজ্যে তারা চিকিৎসার ব্যবস্থার বিরাট উন্নয়ন করেছে। কী উন্নয়ন? তাদের বক্তব্য, তৃণমূল সরকার রাজ্যে ৪১টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল করেছে, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসা বিমার ব্যবস্থা করেছে। হাসপাতালে তারা নাকি বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। নায্য মূল্যের ওষুধের দোকানকেও তারা বিরাট সাফল্য হিসাবে দাবি করছে।

এই দাবির সাথে বাস্তবের মিল কতটুকু? সুপার স্পেশলিটি হাসপাতালগুলির কথাই ধরা যাক। এখানে কেমন চিকিৎসা মেলে? গত ২০ এবং ২১ মার্চ এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক যে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে তার শিরোনাম "ইমারজেন্সি রোগী এলে পত্রপাঠ বিদায়!" কেন বিদায়? কারণ নামটি সুপার স্পেশালিটি হলেও চিকিৎসার ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। চোখ ধাঁধানো ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং থাকলেই তো চিকিৎসা হয় না। দরকার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। সেই কাজটা সরকার করেছে কি?

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বলতে কী বোঝায়? বোঝায় এমন হাসপাতাল যেখানে কার্ডিওলজি, কার্ডিওভাসকুলার সার্জারি, নিউরোলজি, নিউরো সার্জারি, প্লাসটিক সার্জারি, এন্ডোক্রিনোলজি, নেফ্রলজি, ইউরোলজি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি ইত্যাদি বিভাগ থাকবে এবং পর্যাপ্ত সংখ্যায় থাকবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসার সরঞ্জাম পরিক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা, অপারেশনের ব্যবস্থা অন্তর্বিভাগ-বহির্বিভাগ এবং নার্সিং স্টাফ, টেকনিশিয়ান, জেনারেল ডিউটি স্টাফ সহ পর্যাপ্ত লোক বল। এগুলির ব্যবস্থা না করে কেবল সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলেই কোনও হাসপাতাল সুপার স্পেশালিটি স্তরে পৌঁছে যায় না।

সরকারের উদ্দেশ্য যদি সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসার সুযোগ সহজে পৌঁছে দেওয়া হত, তা হলে তারা রাজ্যের ১৩টি মেডিকেল কলেজকেই বেছে নিতে পারত, সেগুলিকে সুপার স্পেশালিটির স্তরে উন্নিত করাই ছিল সহজ উপায়। আর জেলায় জেলায় দরকার ছিল পূর্ণাঙ্গ সাধারণ হাসপাতাল। কারণ মানুষের সবচেয়ে বেশি দরকার লাগে এই ধরনের হাসপাতালেরই। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দরকার বিশেষ কিছু বিরল রোগের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী বলবার তোড়ে মাল্টি স্পেশালিটির সাথে সুপার স্পেশালিটিকে গুলিয়ে ফেলছেন। কলকাতার এস এস কে এম-এর মতো হাসপাতাল বর্তমানে আংশিকভাবে সুপার স্পেশালিটি বিভাগগুলি চালু রয়েছে। তাও ধুঁকছে লোকবল এবং পরিকাঠামোর অভাবে। সেখানে ভর্তি হতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার তারিখ পেতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। অন্য মেডিকেল কলেজগুলির ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টার জরুরি পরিষেবা কোথাও নেই। নিউরোসার্জারির অপারেশনের ব্যবস্থা অন্য কোথাও নেই বললেই চলে। হার্টের অপারেশন এস এস কে এম, এন আর এস, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, আর জি কর মেডিকেল কলেজে কিছু কিছু হলেও অন্যান্য মেডিকেল কলেজে এই বিভাগগুলির অস্তিত্ব প্রায় নেই।

মনে রাখা দরকার স্বাধীনতার পর ভারতে যত স্বাস্থ্য কমিশন বসেছে তারা কেউই ত্রিস্তরীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাইরে যাওয়ার কথা বলেনি। তাদের বক্তব্য প্রথমে থাকবে প্রিভেন্টিভ কেয়ার অর্থাৎ রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা, তারপর থাকবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। সেখান থেকে প্রয়োজন হলে রেফার করতে হবে সেকেন্ডারি বা টার্সিয়ারি কেয়ার সেন্টারে অর্থাৎ মহকুমা জেলা হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজগুলিতে। তা হলে স্বাস্থ্য কমিশনগুলির এই পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেওয়া হল না কেন? দ্বিতীয়ত, জনগণের চিকিৎসাই যদি লক্ষ্য হয় তা হলে তৈরি হওয়া সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ৮০ শতাংশেরও বেশি চিকিৎসক পদ পূরণ করা হয়নি কেন? যে ২০ শতাংশেরও কম চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে, তথ্য বলছে তারা কেউই সুপারস্পেশালিটি ডাক্তার নন। তাদের পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে, যার ফলে মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাও বিঘ্নিত হচ্ছে।

আবার এঁরা সুপারস্পেশালিটি ডাক্তার না হওয়ার কারণে সুপারস্পেশালিটি পরিষেবা দিতে পারছেন না। দুদিক থেকেই সমস্যার। এই ৪১টির মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে অন্তর্বিভাগ চালু হয়েছে, ৩৬টিতে অন্তর্বিভাগ নেই। ফলে ইমারজেন্সি রোগী এলে পত্রপাঠ রেফার করা করা ছাড়া ডাক্তারদের কি কিছু করণীয় আছে?

ডাক্তার ছাড়া হাসপাতাল চলবে না— রাজ্য সরকারের কর্তারা তা বোঝেন না এমন নয়। তা হলে সরকার এই নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে দিল কেন? এর উদ্দেশ্য হল, 'সরকারি জমিতে সরকারি টাকায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করে তারপর চালাতে পারছি না' এই অজুহাতে হাসপাতালগুলিকে বেসররকারি মালিকদের হতে তুলে দেওয়া। আর এই হাসপাতালগুলিতে রোগী সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরিকল্পিত ভাবে সরকারি চালু হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসাকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে। মিডিয়ায় পরিকল্পিতভাবে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সরকার চালাতে না পারলে বেসরকারি হাতে দিক। সরকার দিতেও শুরু করেছে। ইতিমধ্যে শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল জিন্দাল গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প বিমা নির্ভর। রোগীকে এইজন্য প্রিমিয়াম দিতে হয়। সব চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এর সুবিধা মিলবে না। মিলবে শুধু ভর্তি হলে। এ ক্ষেত্রেও সরকারের উদ্দেশ্য বিমা কোম্পানিগুলির সুবিধা

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

চা-শ্রমিকদের সমস্যার কথা মুখেই আনলেন না বিজেপি সভাপতি

চা-বাগান অধ্যুষিত লোকসভা কেন্দ্র ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার। ২৯ মার্চ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করলেন। কিন্তু চা-বাগিচা শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে একটি কথাও বললেন না। এই চা শিল্পের মালিকরা মাঝে মাঝেই নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছামতো লকআউট ঘোষণা করে। হাজার হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়ে পথে বসে। অর্ধাহারে, অনাহারে থাকতে থাকতে অপুষ্টিতে ধুঁকে ধুঁকে কত শ্রমিক মারা যায়। কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই মালিকদের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না। শ্রমিক পরিবারগুলির অভাবের সুযোগ নিয়ে বাইরে কাজ দেওয়ার নাম করে কত মেয়ে পাচার-বিক্রি হয়ে যায়।

এখানকার অর্থনীতির প্রাণ কেন্দ্র চা-বাগান। শিল্প বলতে এটাই। কিন্তু শিল্পের যারা আসল চালক সেই শ্রমিকদের নেই কোনও নিরাপত্তা। নেই ন্যায্য মজুরি। পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই-এর টাকাও মেরে দিয়ে মুনাফা বাড়াচ্ছে মালিকরা। সরকার এদেরই চৌকিদার। 'শোষণের শৃঙ্খল ছাড়া শ্রমিকদের হারানোর কিছু নেই' জানলেই তো শুধু মুক্তি মেলে না। চাই সচেতনতা এবং সংগঠনশক্তি। সিপিএম-আরএসপি দীর্ঘকাল এদের ভোট নিয়ে এমএলএ, এমপি হয়েছে, শোষণ মুক্তির দিশা দেখায়নি। আদর্শগত চেতনার এই ঘাটতির পথ ধরেই নানা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এখানে মাথা তুলছে। আবার ষড়যন্ত্র চলছে এঁদের ভোট লুঠ করে এমপি-মন্ত্রী হওয়ার। এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডা নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড রবিচন রাভা ভোটের প্রচারে নেমেছেন। তাঁর প্রতীক টর্চ লাইট। চা-শ্রমিকদের দাবিগুলি সহ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা নানা অংশের দাবিগুলি তিনি যেমন পার্লামেন্টে তুলে ধরবেন, তেমনই পথে নেমে গণআন্দোলনও গড়ে তুলবেন— জনগণের কাছে এই তাঁর শপথ।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শিক্ষকদের দাবিপত্র পেশ

১৯ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকেরা তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে সামিল হয়েছেন বিক্ষোভ মিছিলে

পড়ুন ও পড়ান

সুপার স্পেশালিটি

সাতের পাতার পর

করে দেওয়া। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের যে কথা সরকার বলছে, সেখানেও রয়েছে অনেক প্রশ্ন। প্রথমত, সব ধরনের ওষুধ সব দোকানে মেলে না। দ্বিতীয়ত, যে ওষুধগুলি পাওয়া যায়, কিছুটা কমিশন মিললেও তার গুণমান নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যেই মতানৈক্য রয়েছে। সর্বোপরি হাসপাতালে একসময় বিনামূল্যে ওষুধ মিলত, সেখানে এখন ন্যায্য মূল্যের নামে দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে সব ওষুধ। এ সবের মধ্য দিয়ে সুকৌশলে হরণ করা হচ্ছে বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকার।

লাভবান পুঁজিপতিরা, খুশি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্পোরেট মালিকরা। সরকারের এই দুরভিসন্ধির পর্দা ফাঁস করে দিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবিতে লড়ছে এসইউসিআই(সি)।

রাজ্য সরকারের ধ্বংসাত্মক আবগারি নীতি

মদ বিক্রি করে দশ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩১ মার্চ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

"মদ বিক্রি করে দশ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজ্য সরকারের আবগারি দপ্তরে যখন খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছে তখন ওই দপ্তরের মন্ত্রী কি জানেন এর জন্য কত পরিবার উচ্ছন্নে গেছে, কত পড়ুয়া কে স্কুল ছাড়তে হয়েছে, অনাহার মৃত্যুতে কত মায়ের কোল খালি হয়েছে, কত নারীর ইজ্জত নষ্ট হয়েছে? তাঁরা কেবল রাজস্বের পরিমাণটা দেখলেন? বিনিময় মূল্যটা দেখলেন না? সিপিএম পরিচালিত বিগত সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া শুরু করেছিল, তৃণমূল তাকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই ধ্বংসাত্মক আবগারি নীতির আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। এস ইউ সি আই (সি) দল রাজ্যে মদ নিষিদ্ধকরার দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করছে। সেই আন্দোলনের চাপে ভোটের মুখে সরকার সাময়িকভাবে নতুন অনুমোদিত ১২০০ মদের দোকান খোলা স্থগিত করেছে। রাজ্যে মদ নিষিদ্ধকরার দাবিতে আগামী দিনে দলের তরফ থেকে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে এই নীতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হবে"।

মদবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেফতার

১৮ মার্চ মন্দিরবাজার থানার ঢোলা-রামগঙ্গা রুটের সুলতানপুর মোড়ে মদের দোকান বন্ধ ও গাববেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে মদ মুক্ত করার দাবিতে পথ অবরোধ করে গাববেড়িয়া সাংস্কৃতিক মঞ্চ।

সুলতানপুরের মদের দোকান ও নতুন করে আরও একটি মদের দোকানের অনুমোদন দেওয়ায় গাববেড়িয়া এলাকায় গড়ে ওঠে মদ বিরোধী এই মঞ্চ। ১৭ মার্চ সুলতানপুরের মদের দোকান থেকে মদ নিয়ে রাস্তায় ওঠার সাথে সাথে বাসের ধাক্কায় স্থানীয় এক যুবকের মৃত্যুতে এলাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং পরের দিন রাস্তা অবরোধ করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েক হাজার নারী-পুরুষ তাতে সামিল হন। খবর পেয়ে, মন্দিরবাজার, কুলপি ও ঢোলা থানার পুলিশ উপস্থিত হয়। পরে ঘটনাস্থলে সি আই, মন্দির বাজারের ডিএসপি, সুন্দরবনের ডিএসপি বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করেন। পুলিশের আক্রমণে ৩০-৩৫ জন নারী-পুরুষ জখম হন। আন্দোলনের নেতা অরবিন্দ প্রামাণিক সহ ৭ জনকে (২ জন মহিলা সহ) গ্রেপ্তার করে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে। তাঁদের বেশ কয়েক দিন জেলে আটকে রাখা হয়। ১৯ মার্চ এলাকার নাগরিক গোপাল হালদার নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে। সরকারের এই ভূমিকায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। গাববেড়িয়া সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করা হয়েছে এবং প্রস্তুতি চলছে আন্দোলনকে বৃহত্তর আকার দেওয়ার।

মুখ্যমন্ত্রী পাশ-ফেল চালুর প্রতিশ্রুতি রাখেননি

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সময় আজকের মুখ্যমন্ত্রী, তদানীন্তন বিরোধী নেত্রী প্রাইমারি স্তরে পাশ-ফেল চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কথা রাখেননি। এস ইউ সি আই (সি)'র দীর্ঘ আন্দোলন, ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই ডাকা বাংলা বনধ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পাশফেল চালুর পক্ষে মত দেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে পাশফেল চালুর পক্ষে আইনও তৈরি হয়েছে। দেশের বেশির ভাগ মানুষ বিশেষত এ রাজ্যের মানুষ প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশফেল চাইলেও অন্তত পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল চালু করতে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছে। তবু তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে মুখ্যমন্ত্রী পাশ-ফেল চালু করেননি। বাস্তবে তৃণমূল সরকারের এই টালবাহনা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা জীবনের সর্বনাশ করেই চলেছে। অন্য দিকে শিক্ষা-ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী কি মনে করেন, এইভাবে টালবাহানা করে ভোট উতরে দিতে পারলেই মানুষ সব ভুলে যাবে? কিন্তু তা হওয়ার নয়। এই নির্বাচনে রাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রেই এস ইউ সি আই (সি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে পাশ-ফেল চালুকে অন্যতম দাবি হিসাবে রেখে। নির্বাচন শেষ হলে আরও অনেক বেশি শক্তি নিয়ে পাশ-ফেল চালুর আন্দোলন গড়ে উঠবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com